31

দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 0 9 DEC 1996

পবিত্র ইসলামী

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিষ্ঠাকারীর নাম হাফেজ মওলানা ছালেহ আহমদ, বয়স প্রায় ৫০ ছুঁই ছুঁই। মাদ্রাসায় তার নাম 'বড় হুজুর'। ধর্মীয় শিক্ষায় শিশুদের শিক্ষিত করার নামে এক আদিম মনোবৃত্তি নিয়ে রেলের পতিত জমিতে হুজুর মওলানা ছালেহ আহমদ গড়ে তুলেছেন এ আস্তানা। আইস ফ্যাক্টরি রোড ও স্টেশন রোডের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে তথাকথিত এ মাদ্রাসার অবস্থান। পুরনো রেল স্টেশনের ঠিক পিছনে ওভারব্রিজ পার হলেই রেল স্টেশন কলোনি সংলগ্ন ১১ হাজার ২শ' বর্গফুটের বিশাল জায়গাজুড়ে চালু রয়েছে এ বন্দী শিবির। হুজুর ছালেহ আহমদ ভাড়া হিসাবে প্রতিবছর রেলকে দিয়ে থাকেন মাত্র ১শ' টাকা। আধাপাকা টিনশেডযুক্ত একটি মসজিদ বেড়া দিয়ে নির্মিত অপর দু'টি গৃহ আছে মাদ্রাসায়। চারদিকে ইটের শক্ত দেয়াল এবং একমাত্র প্রবেশ পথে রয়েছে পর পর দু'টি লৌহ নির্মিত মজবুত গেট। ২৪ ঘণ্টা ঝোলানো থাকে বড় বড় তালা। ভিতর থেকে কোন শিক্ষার্থী যেমন বের হতে পারে না তেমনি বাইরে থেকে কারও প্রবেশাধিকার নেই। ফলে এর অভ্যন্তরে কি ঘটছে তা সকলের কাছেই অজ্ঞাত। দিন পাঁচেক আগে আইস ফ্যাক্টরি রোডে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে ৩ শিশুর পায়ে লোহার শিকল পরিয়ে ওয়েল্ডিং করার মুহূর্তে খবরটি পাওয়া যায়। কিন্তু একের পর এক চেষ্টা চালিয়েও ঐ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। রবিবার সকালে সিএমপির উপপুলিশ কমিশনার মালিক খসরু ও কোতোয়ালি থানার ওসি কামরুল ইসলামকে জনকণ্ঠের পক্ষে এ তথ্য জানিয়ে পুলিশী সহায়তায় এ প্রতিবেদক ও আলোকচিত্র সাংবাদিক মশিউর রেহমান সকাল সাড়ে দশটায় তথাকথিত মাদ্রাসায় পৌঁছে যান। প্রধান ফটকটি ধাক্কা দিয়ে খোলেন ওসি কামরুল ইসলাম নিজে এবং তাঁকে অনুসরণ করেন এ প্রতিবেদক। পরের গেট ছিল তালাবদ্ধ। আগন্তুক দেখতে পেয়ে সুঠামদেহী এক লোক এগিয়ে আসেন এবং ওসির নির্দেশে তা খোলা হয়। মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখা গেল বর্বরতম সেই চিত্র। প্রায় ৬০ থেকে ৭০টি শিশু ঘোরাফেরা করছে দু'পায়ে শিকল পরিহিত ও শিকলের সাথে যুক্ত ভারি, টুকরা রেলবিট নিয়ে। ওজন সামলাতে না পেরে রেলবিটের টুকরাগুলো কেউ কাঁধে নিয়েছে, কেউ রেখেছে পায়ের পাশে মাটিতে। ক্যামেরা হাতে লোক দেখে কোমলমতি এ শিশুর দল হুড়মুড় করে সামনে এসে দাঁড়ায়। অপার এক আনন্দে তারা ফটো তোলার পোজ দিতে থাকে। অমানুষিক নির্যাতনে কারও পা, কারও হাত ছিল ভাঙ্গা। দিনরাত লোহার বেড়ির ঘর্ষণে কারও পায়ে হয়ে গেছে দগদগে ঘা। সে এক অবিশ্বাস্য লোমহর্ষক চিত্র। এমনি সময় শেষ ঘরটি থেকে গেঞ্জি গায়ে ছুটে এলেন সেই কথিত 'বড় হুজুর' মওলানা ছালেহ আহমদ। তাঁর উৎকণ্ঠিত প্রথম প্রশ্ন ছিল, কি চান? আসুন অফিস ঘরে আসুন। ওসি'র উপস্থিতিতে সাহস সঞ্চয় করে যাওয়া হলো অফিস ঘরে। কোথাও কোন চেয়ার-টেবিল নেই। সবই চলে মাটিতে বসে। এটি কোন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন প্রশ্নের উত্তরে বিরক্তি মনোভাবে হুজুর বললেন, কোরানে হাফেজ করার দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু তার জন্য এমন ইসলামবিরোধী বর্বরোচিত প্রথা কেন? তিনি বললেন, সবাই পালাতে চায়, তাই। কি কি শিক্ষা দেন? জানালেন কোরান মুখস্থ করা, ইলেকট্রিক, কারিগরি পাইপ ফিটিং ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, পুরো অঙ্গন জুড়ে কারিগরি শিক্ষার কোন ধরনের সাজসরঞ্জাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি এ জাতীয় শিক্ষা দেয়ার কোন লোকও নেই। সবই বড় হুজুর দিয়ে থাকেন। জানালেন খাওয়া-দাওয়া তিন বেলা গরম ভাত। ঘুমানোর ব্যবস্থা ফ্লোরে। হুজুর বললেন, পিতামাতার অবাধ্য ও আগ্রহী পরিবারের পক্ষ থেকে শিশুদের তাঁর হেফাজতে দেয়া হয়। কমপক্ষে ৩ বছর বা আরও পরে বিশেষ করে কোরান হেফজ শেষে তারা ফিরে যায়। তাঁর মতে তখন তারা ভাল হয়ে ঘরে ফিরে যায়। এমনি সময়ে সুঠামদেহী মস্তান জাতের কিছু লোক দু'টি প্রবেশ পথেই তালা লাগিয়ে দেয়। আটকা পড়ে যাই সকলে। ওসি'র সাথে ছিল মাত্র তাঁর দুই বডিগার্ড। সুতরাং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে হুজুরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তালা খুলিয়ে অনুসন্ধান পর্বের সমাপ্তি টানা হয়। বিকট শব্দে ফটক দু'টি আবারও বন্ধ হয়ে যায় সাথে সাথে।

আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশ যখন এগিয়ে চলেছে তখন এ ধরনের জঘন্যতম অপরাধের অন্তর্নিহিত আরও রহস্য জানতে কথা বলি এলাকাবাসীর সাথে। রেল স্টেশন কলোনি ও কিছু বস্তি ঘর নিয়ে গড়েওঠা এলাকার লোকজন যা জানালেন তা আরও হৃদয়বিদারক এবং মানবতা ও আইনের পরিপন্থী।

হুজুর নিয়ন্ত্রিত চক্রের মস্তানদের ভয়ে কেউ নাম না জানিয়ে বললেন, প্রায় রাতে শোনা যায়, শিশুদের করুণ আর্তনাদ। শাসনের নামে চলে ক্রীতদাস প্রথার নির্যাতন। কখনও সমস্বরে কখনও একক কণ্ঠে গোঙানি আতঙ্কিত করে তাঁদের। ফেনসিডিল ও মাদক সেবনকারীদের আখড়া চিহ্নিত এলাকায় সাধারণ মানুষ বলা চলে সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত। অনেকে প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন কিন্তু সাহসে কুলায়নি।

কথা বলি আইস ফ্যাক্টরি রোডের ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ মালিকের সাথে। তাঁরা জানালেন, দু'একদিন পর পরই শিশুদের রশি বেঁধে তাদের দোকানে আনা হয়। এরপর দু'পায়ে শিকলযুক্ত বেড়ি ও টুকরা রেলবিট ওয়েল্ডিং করে নেয়া হয়। প্রতিজনে ওয়েল্ডিং বাবদ তারা পান ৩০/৪০ টাকা করে।

যোগাযোগ করা হয় রেল কর্তৃপক্ষের সাথে। পূর্বাঞ্চলীয় রেলের চীফ এস্টেট অফিসার মোহাম্মদ ইকবাল মোল্লা বললেন, রেলের তৎকালীন বোর্ড '৮১ সালের ১০ ডিসেম্বর উক্ত মাদ্রাসার নামে এ জায়গা লীজ দিয়েছে বছরে এক শ' টাকা করে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার নামে কি চলছে তা তদারকির কোন ব্যবস্থা তাঁদের নেই।

সিএমপি কমিশনার মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী বললেন, এ ধরনের অমানবিক ঘটনা পুলিশ অবহিত নয়। যদি তা সত্য হয় তাহলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। এটা তো 'রংফুল কনফাইনমেন্ট'। অবহিত যখন হলাম অবশ্যই পুলিশ এ্যাকশানে যাবে। আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে মহানগর হাকিম মাঈনুদ্দিন খন্দকার বলেন, আইনের দৃষ্টিতে ১২ বছরের নিচে স্থূলবুদ্ধির যে কোন শিশুর কাজ অপরাধ বলে গণ্য নয়। এ ঘটনা শিক্ষার নামে সামাজিক অপরাধ। কোন সভ্য দেশ এটি অনুমোদন করে না। এ ছাড়া জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদেরও চরম লঙ্ঘন বটে। ঘটনা প্রমাণিত হলে তা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া নিয়ে বাংলাদেশও যখন এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে এই ধরনের বর্বর ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লৌহ যবনিকার অন্তরালে ডাণ্ডাবেড়ি ও শিকল পরিয়ে শিশুদের সুকুমার বৃত্তিকে বিধ্বস্ত করার এ কোন অপপ্রয়াস? প্রশ্ন উঠেছে, পবিত্র ইসলাম ধর্মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে এমন একটি বর্বর অমানবিক ব্যবস্থা কোন অনৈতিক পদ্ধতিতে টিকে আছে সরকারী জায়গায়, তা নিয়ে। পিতামাতার আপত্য স্নেহবঞ্চিত এ সব শিশুর ওপর দিনরাত নারকীয় নির্যাতন অভিভাবক মহলেও অজানা। কারণ, মাদ্রাসা অভ্যন্তরের কথা বাইরে বলা একেবারে নিষিদ্ধ। 'দ্বীনি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' শিরোনামে হুজুরের প্রকাশিত একটি প্রচারপত্রে লেখা আছে, দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনের আশা করা জঘণ্যতম অপরাধ। এ মাদ্রাসার লক্ষ্য হচ্ছে উম্মতের হেদায়েতের জন্য এমন একদল আলেম তৈরি করা যারা এলম ও আমলের ক্ষেত্রে ছলফ ও বুজুর্গানে দ্বীনের আদর্শ অনুসরণ করবে। যারা কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে নিজেদের সন্তানদের লেখাপড়া করাতে প্রস্তুত তাদের জন্য এ মাদ্রাসা।

জরুরী নিয়ম-কানুনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ ছেলে পড়াতে হলে মনকে খুব শক্ত করতে হবে। ছেলের প্রতি মায়া কমাতে হবে। ওস্তাদের হাতে হাওলা করে দিতে হবে। ওস্তাদের শাসনের বিরুদ্ধে পাল্টাপ্রতিবাদ করা যাবে না। শাসনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা পিতামাতাকে বরদাস্ত করতে হবে। মাদ্রাসায় ছেলেকে দেয়ার পর অন্যখানে নেয়া যাবে না। মাদ্রাসায় ওস্তাদ দ্বারা কোন অসুবিধা হলে তা বাইরে বলা যাবে না। এ জাতীয় মুচলেকা স্বাক্ষর করে অভিভাবকদের ছেলে ভর্তি করাতে হয়।

প্রচারপত্রে ছাত্র ভর্তির ফিস এককালীন ২৫০ টাকা ও মাসিক ৫০ টাকা করে বেতন প্রদান করতে হবে বলা হলেও নেয়া হয় যথাক্রমে ১১০০ শ' টাকা ও ৭শ' টাকা হারে। লেখাপড়ার নিয়ম ভোর ৪টা থেকে সকাল ১০টা, ৩ ঘণ্টা বিশ্রাম শেষে বেলা ১টা থেকে বিকাল ৫টা এবং মাগরিবের পর থেকে রাত ৯টা। ডাণ্ডাবেড়ি ও শিকল পরিহিত ছাত্রদের দিনের পর দিন তা সাথে রেখেই খাওয়া-দাওয়া, হাঁটাচলা ও নিদ্রা যেতে হয়। এ ধরনের বর্বর ঘটনা কোন শক্তির প্রভাবে গত ১৫ বছর ধরে চলে আসছে তা রীতিমতো আশ্চর্যজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সাথে কোন রাজনৈতিক দল বা কোন বহিঃশক্তি জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। আর বিগত ১৫ বছর যাবত দেশের সরকারগুলো এ ধরনের একটি জঘন্য কর্মকাণ্ড কেন উদ্‌ঘাটন করেনি তাও পর্যবেক্ষক মহলের প্রশ্ন।

পুলিশ ৩ হুজুরকে

(প্রথম পাতার পর)

শতাধিক পুলিশ ঝটিকা অভিযান চালিয়ে রবিবার রাতে তথাকথিত মাদ্রাসা নামের এ বন্দী শিবির থেকে ২৪ শিশুকে উদ্ধার করেছে। গ্রেফতার করেছে হাফেজ মওলানা ছালেহ আহমদসহ ৩ হুজুরকে। উদ্ধারকৃত সব শিশুই ছিল ডাণ্ডাবেড়িযুক্ত শিকল পরা।

দৈনিক জনকণ্ঠের কাছ থেকে সকালে চট্টগ্রামে মধ্যযুগীয় বর্বরতার এ খবর অবহিত হয়ে মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে সিএমপি কমিশনার মোদাব্বির হোসেন চৌধুরীকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। প্রায় শতাধিক দাঙ্গা পুলিশ নিয়ে কোতোয়ালি থানার ওসি কামরুল ইসলাম সন্ধ্যায় তথাকথিত মাদ্রাসটি ঘিরে ফেলেন এবং ৩ হুজুরকে গ্রেফতার ও ২৪ শিশুকে উদ্ধার করেন। পুলিশ জানায়, শিশু নির্যাতন আইনে একটি মামলা করা হচ্ছে। পুলিশী অভিযান চালানোর পর এলাকায় শত শত মানুষ ও ছাত্রদের বহু অভিভাবক থানায় ভিড় জমান। বন্ধি জীবন থেকে মুক্ত হয়ে শিশুরা ছিল উৎফুল্ল।